জাগরী

রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত ১৯৫০

সতীনাথ ভাদুড়ী

জাগরী
সতীনাথ ভাদুড়ী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ৩২৫ টাকা

JAGARI by Satinath Bhaduri Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 Second Edition: February 2020
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736 Price: 325 Taka RS: 325 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-93397-3-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

যে সকল অখ্যাতনামা রাজনৈতিক কর্মীর
কর্মনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের বিবরণ, জাতীয়
ইতিহাসে কোনোদিনই লিখিত হইবে না,
তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

রাজনৈতিক জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই আলোড়নের তরঙ্গবিক্ষোভ কোনো কোনো স্থলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিতেও আঘাত করিতেছে। এইরূপ একটি পরিবারের কাহিনী।

গল্পটি ১৯৪২ সালের আগস্ট-আন্দোলনের পটভূমিকায় পড়িতে হইবে। কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে প্রচার করা বইখানির উদ্দেশ্য নয়।

স্থানীয় বর্ণ বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অনেক স্থলে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। ছাপা কার্যের অনবধানতায় কিছু কিছু ত্রুটি রহিয়া গেল; আশা করি পাঠকবর্গ মার্জনা করিবেন।

পূর্ণিয়া ৭।৯।৪৫ **সতীনাথ ভাদুড়ী**

সূচি

ফাঁসি সেল : বিলু ৭
আপার ডিভিসন ওয়ার্ড : বাবা ৬১
আওরত কিতা : মা ১০৩
জেল গেট : নীলু ১৪১

ফাঁসি সেল : বিলু

দুই নম্বর ওয়ার্ডের অশত্থ গাছটির উপরের শাখাটিতে গোধূলির ম্লান আলো চিক-চিক করিতেছে। অনেকগুলি পাখি একবার এ ডালে একবার ও ডালে যাইতেছে। এক দণ্ডও বিশ্রাম নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই তো চতুর্দিক অন্ধকারে ঢাকিয়া যাইবে। তাহার পর সারা রাত নিঝুমের পালা;—তাই বোধহয় শেষ মুহূর্তের এই চঞ্চলতা, এত ডানা ঝটপটানি, এত আনন্দ উৎসব—যতটুকু আনন্দ সময়ের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া যায়। সত্যই কি পাখিগুলি এই জন্য সন্ধ্যার সময় এত চঞ্চল হয়? এই সেলে আসিবার আগে, দু নম্বর ওয়ার্ডে যখন ছিলাম, প্রত্যহ সন্ধ্যায় লক-আপের পূর্বে আমরাও সকলে বাহিরের খোলা হাওয়া খানিকটা খাইয়া লইতাম। সত্যই কি দরকারের জন্য? না। হয়তো ঘরের মধ্যে বসিয়া আছি। কোনো দরকার নাই বাহিরে আসিবার। তথাপি বাহিরে একবার আসা চাই-ই। বেশির ভাগ রাজবন্দীরই তো এই মনোবৃত্তি দেখিতাম। ওয়ার্ডাররা বিরক্ত হইত। নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করিত—ভাবটা এই যে স্বরাজীরা তাহাদের ইচ্ছা করিয়া জ্বালাতন করে। কিন্তু কেহই ওয়ার্ডারদের বিরক্ত করার জন্য এ-কাজ করিত না। যতটুকু উপভোগ করিয়া লওয়া যায় তাহা কেহ ছাড়িবে কেন?

ওগুলি বোধ হয় কাক—এত দূর হইতে ঠিক চেনা যায় না... পাখিরা কিন্তু রাত্রেও ডানা ঝটপট করে...

সেই একবার বকড়ীকোলে মিটিং করিয়া ফিরিবার সময় কামাখ্যাথানের বিরাট বটগাছের নিচে আমাদের সারারাত থাকিতে হইয়াছিল। এখানকার মাটিতে শুইয়া থাকিলে নাকি কুষ্ঠ রোগ সারিয়া যায়। দূর দূরান্তর হইতে কত লোক এই উদ্দেশ্যে এখানে আসে। অনেকগুলি কুষ্ঠরোগী আশেপাশের গাছগুলির নিচে শুইয়া রহিয়াছে। ছিলাম আমি আর নীলু; আর সঙ্গে ছিল বোধ হয় সহদেও। সারারাত পাখির ডানা নাড়ার সে কী শব্দ! গাছতলায় তিনজন পাশাপাশি শুইয়া আছি। এই গাছতলায় আস্তানা লওয়ার জন্য নীলুকে যেন একটু বিরক্ত মনে হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এগুলো ডানা ঝটপট করছে কেন বলতে পারিস?' নীলু বলিল, 'পিঁপড়ে টিপড়ে কামড়ায় বোধহয়!' উহার ভাবিতে সময়ও লাগে না। সব বিষয়েই উহার স্থির মত আছে। সে মতের সহজে নড়চড়ও হয় না। চিরকাল নীলুটা ঐ রকম।...

সন্ধ্যার লালিমা ধূসর হইয়া আসিতেছে। অশত্থ গাছের ডগাটিতে সিঁদুরে

আকাশের আভা লাগিয়াছে। গাছের পাতাগুলি আর ঠিক সবুজ বলিয়া ধরা যাইতেছে না। যাক, গাছের পাতার সবুজটা গেল—ঐ একটু সবুজই তো এখান হইতে দেখা যাইত। এছাড়া দেখা যায় এক ফালি নীল আকাশ—লোহার গরাদের মধ্য দিয়া—লোহার তারের টোস্টারের মধ্যে এক স্লাইস পাউরুটির মতো, সেলের বাসিন্দার কাছে সেই রকমই বাস্তব,—সি ক্লাস-বন্দীর ডায়েটের চাইতে তৃপ্তিকর। আর দেখা যায় জেল 'গুমটি'র[১] উপরতলা—তাহার দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা—'পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেল, বিহার।' আকাশের ঐ ফালিটুকু আমার একান্ত আপন—ও যে আমার নিজস্ব জিনিস। যতক্ষণ দেখা যায় ঐ স্বচ্ছ নীল রঙ দেখিয়া লইয়াছি। এমন করিয়া, আমার মতো করিয়া, আকাশের ঠিক ঐ অংশটুকুকে কি আর কেহ পাইয়াছে? আমার নীল আকাশ মুহূর্তে মুহূর্তে রূপ বদলাইতেছে। সিঁদুরে রঙ বেগুনী হইয়া উঠিল—দেখিতে দেখিতে ধূসর হইয়া উঠিতেছে—আবার এখনই জমাট অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে। এমন বৈচিত্র্যময় রসের উৎসকে জেলর সাহেব একজন সর্বহারা বন্দীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি করিতে কেন যে দিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না। বোধ হয় তাঁহারা জানেন না—জানিতে পারিলে হয়তো কাল হইতেই রাজমিস্ত্রী 'কম্যান্ডের'[২] কয়েদীদিগকে, আমার সম্মুখের প্রাচীর আরও উঁচু করিবার কাজ দেওয়া হইবে—হুকুম হইবে 'ঔর উঁচা, ঔর ভী উঁচা, জরুরৎ পড়ে তো, আসমান তক ভিড়া দো'[৩]। ঐ গাছের সবুজটুকু ও আকাশের টুকরোটি ছাড়া, এখান হইতে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা কেবল লোহা, ইট আর সিমেন্ট, সিমেন্ট, ইট আর লোহা। উহা চক্ষুকে প্রলুব্ধ করে না—দৃষ্টিকে প্রতিহত করে মাত্র, তাহাকে ঠিকরাইয়া ফিরাইয়া দেয়। ঐ সবুজ আর নীল ছাড়া, আর যে কোনো রঙই দেখি, সবই রুক্ষ ও কঠোর মনে হয়—চক্ষুকে পীড়া দেয়। সেলের চুনকাম করা সাদা দেওয়াল তাহাও বড় প্রাণহীন, বড়ই পাণ্ডুর। তাহার ওপর কতদিন চুনকাম করা হয় নাই কে জানে? দেওয়াল ভরিয়া নানারকম দাগ—থুতুর দাগই বেশি—কেমন যেন পাঁশুটে রঙ—বোধহয় আমার পূর্বের কোনো বাসিন্দাকে সিপাহীজীরা 'খয়নি' খাওয়াইয়াছিল। সে কবে সব ছাড়িয়া কোন অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে,—কেবল রাখিয়া গিয়াছে দেওয়ালে সিপাহীজীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার ছাপ।

কথা বলিবার লোক নাই। সেইজন্য সেলের বাহিরের জেল-জগতের সহিত সম্বন্ধ কান দিয়া। কথা বলিতে পারি একমাত্র ওয়ার্ডারের সঙ্গে—তাহাও ভাল লাগে না। চারিদিকে দেওয়াল। যে দিকে তাকাও দৃষ্টি দেওয়ালে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, কিন্তু সর্বদা উৎকর্ণ হইয়া থাকি, যদি বাহির হইতে কিছু শোনা

---

[১] Central Tower, জেলের ভিতরের কর্মকেন্দ্র।

[২] জেলের কয়েদীদের কাজের বিভাগ।

[৩] 'আরও উঁচু আরও একটু উঁচু; দরকার পড়িলে, আকাশ পর্যন্ত ঠেকাইয়া দাও'।

যায়। ষোল পা লম্বা, দশ পা চওড়া ঘর। সম্মুখের দিকে মোটা লোহার গরাদের দরজা। দক্ষিণে দেওয়ালে ছাতের কাছাকাছি একটি ছোট গবাক্ষ। তাহারই নিচে, মেঝের সঙ্গে একহাত চওড়া ও দেড় হাত লম্বা দুইখানি মোটা লোহার পাত দেওয়ালে বসানো। ইহাতে কতকগুলি ছিদ্র আছে। ইহার প্রয়োজন কী তাহা জানি না—বোধহয় বাতাস আসিবার জন্য! কিংবা বোধহয় এই ছিদ্রপথে বাহিরের ওয়ার্ডার শুনিতে পায় কয়েদী কী বলিতেছে। সম্মুখের গরাদের দরজার নিকট তো একজন ওয়ার্ডার থাকেই—সে তো কয়েদী, কী করিতেছে, না করিতেছে তাহা সম্পূর্ণ পরিষ্কারভাবেই দেখিতে পায়। তবুও কেন এই ব্যবস্থা বলিতে পারি না। ঘরের আসবাবের মধ্যে দুইটি আলকাতরা মাখানো মাটির মালসা (স্থানীয় জেলের ভাষায় 'টোকরী') এককোণে রাখা রহিয়াছে। ঐ কোণটিতে মেঝে চুনকাম করা—বৃত্তের চতুর্থাংশের আকারে। সেলের বাহিরে গবাক্ষের দিকের দেওয়ালের পাশ দিয়া গিয়াছে একটি চওড়া পাকা রাস্তা। রাস্তাটি বৃত্তাকারে জেলের সব ওয়ার্ডারগুলিকে ঘিরিয়া আছে। এই রাস্তার অপর পারে জেল হাসপাতালের প্রাচীর। এই রাস্তাটি দিয়া কত লোক যাতায়াত করে—কত কয়েদী, ওয়ার্ডার, ডাক্তার, কম্পাউন্ডার, ঠিকাদার, অফিসার, মিস্ত্রী—আরও কত লোক। দিনের বেলা বেশ জনবহুল মফস্বল শহরের রাস্তার মতো মনে হয়। আর এই বিরাট পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেল শহর হইতে কম কিসে? সাধারণ সময় থাকে প্রায় পঁচিশ শত কয়েদী। আর এখন ১৯৪৩ সালের মে মাসে আছে সাড়ে চার হাজার। আরও বাড়ে না কেন তাহাই আশ্চর্য। বাহিরে না খাইতে পাইয়া পথে ঘাটে মরিয়া পড়িয়া থাকিবে—তথাপি আমাদের দেশের লোক এমন কিছু করিবে না, যাহাতে তাহাদের জেলে আসিতে হয়। একবার 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলিলে বা ময়রার দোকান হইতে একমুঠো খাবার তুলিয়া লইলে যদি ছয় মাসের মতো অন্নজল ও মাথা গুঁজিবার স্থানের বন্দোবস্ত হইয়া যায়—তবে না খাইয়া মরিবার প্রয়োজন কী... সাড়ে চার হাজার... কোনো শহরে পাঁচ হাজার লোকের বসতি হইলেই, তাহা মিউনিসিপ্যালিটি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। জেলও যেন একটি ছোটখাটো শহর। এই শহরের নাম 'লৌহগরাদ' হইলে বেশ হয়, ধ্বনির ঝঙ্কারে ঠিক লেনিনগ্রাদের মতো শুনিতে লাগে। ...লোহার পাতের ছিদ্রপথে কান দিয়া বসিয়া থাকি। মানুষের গলার স্বর, এত মিষ্ট লাগে। জেলের পলিটিক্স, জেলের বাইরের পলিটিক্স, সব এখানে বসিয়া থাকিলে জানিতে পারা যায়,—সুপারিন্টেন্ডেন্টের সহিত জেলর বাবুর বনিবনা হইতেছে না, হেড জমাদারকে জেলর বাবু 'আপ' বলেন না 'তুম' বলেন। জাপানিদের রণকৌশলের কথা, জেলে কয়েদীর সংখ্যাধিক্যের জন্য কত কয়েদীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে (জেলের ভাষায় 'ছাঁটাইয়া'), বর্মার জেলস্টাফ দল পাকাইয়া বিহারী জেল কর্মচারীদিগকে কোণঠাসা করিবার চেষ্টা করিতেছে—এই সব কথা—আরও কত কথা কানে ভাসিয়া আসে। রাজবন্দীদের উপর সেদিনকার লাঠিচার্জ হওয়ার পর, কয়বার

হাসপাতালে স্ট্রেচার আসিল, গেল, তাহার হিসাব করা গিয়াছিল এইখানে বসিয়াই। ঝনঝন লোহার শব্দ শুনিলেই বুঝিতে পারি যে, যে কয়েদীটি যাইতেছে তাহার 'বার ফেটার্সে'র (স্থানীয় ভাষায় 'ডাণ্ডাবেড়ী') সাজা হইয়াছে, বোধহয় সে কোনো জেল-কর্মচারীর হুকুম অমান্য করিয়াছিল।...

কী মজা! সন্ধ্যা হইলে আর কি রক্ষা আছে? সেদিন সুপারিন্টেন্ডেন্ট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন... কোনো জিনিসপত্রের দরকার আছে কি না অর্থাৎ যাহা চাও সম্ভব হইলে দিব। ছোটবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে ফাঁসির আসামিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করে; আর অধিকাংশ লোকই ভাল খাবার-টাবার খাইতে চায়। নূতন সুপারিন্টেন্ডেন্টও কি আমার নিকট হইতে এরূপ প্রার্থনা আশা করিয়াছিলেন নাকি? আমার খুব লোভ হইয়াছিল একটি মশারির কথা বলিতে—যে কয়দিন আরামে ঘুমাইয়া লওয়া যায়; কিন্তু বলিবার সময় বলিতে পারিলাম না। কেমন যেন আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে লাগিল! বলিলাম, 'ধন্যবাদ, আমি বেশ আরামেই আছি। কোনো জিনিসের দরকার নেই—' ওয়ার্ডাররা পরে আমাকে বলিয়াছিল—উড়িষ্যার কোন করদরাজ্যের দুজন 'স্বরাজী' বাবুর এই জেলে ফাঁসি হইয়াছিল—একজন ছিল আপনার এই এক নম্বর সেলে, আর একজন দুই নম্বরে—তাহারা সাহেব মারিয়াছিল—'একদম জানসে—পাঁচ সালকি বাৎ'[১]—তাহারা নাকি ফাঁসির আগের দিন অনেকগুলি করিয়া মুরগির আণ্ডা ভাজিয়া খাইয়াছিল। তাহার পর রাত্র 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' আরও কী কী 'নারা'[২] লাগাইতে থাকে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহারা 'নারা' লাগায়। সে রাত্রে কোনো কয়েদী ঘুমাইতে পারে নাই। আপনিও যে জিনিস খাইতে ইচ্ছা করেন চাহিলেন না কেন?

ওয়ার্ডারের কথা অবিশ্বাস করি নাই। কিন্তু তাহার উপদেশ মনে ধরে নাই। এই ওয়ার্ডাররা অশিক্ষিত; সুবিধা পাইলেই চুরি করে। কয়েদীদের ওপর প্রভুত্ব ফলায়। দুর্বলচিত্ত কয়েদীর ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে। কিন্তু রাশভারি কয়েদীদের সমীহ করিয়া চলে। ইহারা সরল প্রকৃতির লোক—কথার মারপ্যাঁচ বোঝে না—সৌজন্যের ধার ধারে না। সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রভৃতি সকলেই শিষ্টাচারের খাতিরে আমার সম্মুখে ফাঁসি বা তৎসংক্রান্ত কোনো বিষয়ের উল্লেখ করেন না। কিন্তু ওয়ার্ডাররা প্রত্যেকেই দুই একটি কথা বলিবার পরই ফাঁসির কথার উল্লেখ করে। প্রথম কয়েক দিন কথাটি শুনিলেই কেমন বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিত—একটু যেন নিজেকে দুর্বল দুর্বল মনে হইত—কেমন যেন আনমনা হইয়া যাইতাম—ফাঁসির সমস্তদৃশ্য আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। হয়তো আমার ফাঁসির হুকুম রদ হইয়া যাইবে—এই বলিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিতে

[১] একেবারে প্রাণে—পাঁচবছর আগের কথা।

[২] জয়ধ্বনি

হইত। দিন কয়েকের মধ্যে ঐ সকল কথা সহিয়া গেল। আর এখন ও কথায় কিছু মনে হয় না। সেলের ঠিক পশ্চিমেই ফাঁসির মঞ্চ। ওয়ার্ডাররাই আসিয়া খবর দেয়—আজ ফাঁসিকাষ্ঠে কালো রঙ দিয়াছে—আজ ফাঁসিকাষ্ঠে কালো রঙ দিয়াছে—আজ দড়ির সহিত আমার ওজনের একটি বালির বস্তা বাঁধিয়া দড়িটি ঠিক মজবুত কিনা তাহার পরীক্ষা করা হইতেছে;—আরও কত এই রকম খবর।

আশ্চর্য আমার মনের গতি! কালো রঙের কথা শুনিয়াই ভাবি ব্ল্যাক-জাপান না আলকাতরা? ওয়ার্ডারকে জিজ্ঞাসা করি, আলকাতরা না কি? দড়িটা কিসের? শনের না কি? নিজের মনের ওপর নিজেরই বিদ্রূপ করিতে ইচ্ছা হয়। এখনও কি দড়িটি কিসের তৈরি সেই কথাটি জানাই আমার বেশি দরকার! চিরকাল আমার মনের এই অদ্ভুত গতি আমি লক্ষ্য করিয়াছি। প্রয়োজনীয় অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় বিষয়েই আমার আকর্ষণ বেশি। পরীক্ষার পূর্বে সকলেই প্রশ্নগুলি তৈয়ারি করিতেছে—আর আমার তাহা তৈয়ারি না থাকিলেও হয়তো তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো তুচ্ছ কথার ওপর আমার মনোযোগ ন্যস্ত। জ্যামিতির প্রয়োজনীয় থিয়োরেম অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় এক্সট্রার ওপর আমার অযথা মনোযোগ;—ফুটনোট ভূমিকা প্রভৃতি হয়তো পরীক্ষার আগের দিনও দেখিতেছি! বৎসরের প্রথম হইতেই মনে হইয়াছে—দরকারী জিনিসগুলি তো পরে পড়িতেই হইবে—এখন খুঁটিনাটিগুলি পড়া যাক। হয়তো শেষ পর্যন্ত আসলটিই পড়া হয় নাই।

মনে পড়িতেছে কাশী বিদ্যাপীঠে পড়িবার সময়ের একটি রাত্রের কথা। রাত জাগিয়া পড়িতেছি আমি আর শকলদেও। এক টিপ নস্য লইয়া রাতদুপুরে সে 'আজ'-এর সম্পাদকীয় পড়িয়া আমাকে শুনাইতে লাগল। কাশী বিদ্যাপীঠে পড়িবার সময় সেবার যখন পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে—সন্দেহক্রমে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের চার্জে—তখন স্বতঃই ফাঁসির কথা মনে হইত। পরে পুলিশ প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দেয়। সত্যই আমি উহাতে লিপ্ত ছিলাম না। কিন্তু ফাঁসি যাওয়ার ভয় আমার বিলক্ষণ ছিল। বোধহয় সত্যসত্যই ফাঁসির হুকুম হইয়া গিয়াছে বলিয়া ভয় কমিয়া গিয়াছে। দূর হইতেই ভয়টা বেশি থাকে। যাহারা জেলে আসে নাই তাহারা জেলে আসাটাকেই কী কঠিন ব্যাপার মনে করেন, কিন্তু আসিয়া পড়িলে তখন ভয় ভাঙিয়া যায়।

উঃ! মশার কামড়ে সত্যই বড় কষ্ট হয়। কেন জানি না আমাদের গান্ধী আশ্রমের মশাগুলি ইহাদের অপেক্ষা জোরে ডাকে, আকারেও বড়, কিন্তু মনে হয় কামড়াইলে জ্বালা কম করে। নীলু থাকিলে ঠিক আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিত, 'এরা আশ্রমের মশা কিনা—অহিংস উপায়ে রক্ত খেতে শিখেছে।' মা হাসি চাপিয়া মুখে বিরক্তির ভাব আনিয়া বলিতেন, 'আচ্ছা হয়েছে, আপনি এখন আসুন তো।' মায়ের এই সময়ের মুখখানি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। চোখের কোণে দুইটি করিযা বলি রেখা পড়িয়াছে।...মা'র মনে সব সময় একটা ভয় ভাব দেখিতে পাই—এই বুঝি নীলু বাবাকে ঠেস দিয়া কিছু বলিল! অথচ কিছু বলিলে সে

কথাটা যাহাতে বাবার কানে না ওঠে তাহারও যথেষ্ট চেষ্টা দেখিয়াছি। নীল চিরকাল স্পষ্টবক্তা। তাহার জন্য কতবার গোলমালে পড়িয়াছে। কিন্তু অপর লোকে তাহার কথায় কিছু মনে করিতে পারে বা তাহার কাজে ক্ষুব্ধ হইতে পারে এ জিনিসটাকে চিরকাল তাচ্ছিল্য করিয়া গিয়াছে। সূক্ষ্ম জিনিস তাহার মনে সাড়া দেয় না। নীলুর মন ও দৃষ্টিভঙ্গী স্থূল! কলম তুলিকা তাহার জন্য নয়—সে বোঝে কায়িক পরিশ্রমের কথা, হাতুড়ি কাস্তে শাবলের কথা, আর তার হাতে শোভা পায় ইস্পাতের ক্ষুরধার অসি—'পরশুরামের কুঠারের মতো' নিষ্করুণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ। একবার নীলু বলিয়াছিল যে তাহার কবিতা ভাল লাগে না। আমি বলিয়াছিলাম যে, এমন কবিতা লিখিয়া দিব যাহা তাহার নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে। লিখিয়া দিয়াছিলাম। ধনিক শ্রমিক প্রভৃতি দেওয়া একটি লাঠি মারা গোছের সনেট! নীলুর খুব ভাল লাগিয়াছিল। কবিতাটি মনে নাই—এক লাইনও না। নীলু সেটিকেও বাঁধাইয়া আশ্রমের ঘরে টাঙাইয়া রাখিয়াছিল—মা'র ঘরে।...

মনে হইতেছে মা দাওয়ায় বসিয়া আছেন। মাথা নাড়িতে নাড়িতে নীলুর দিকে তাকাইয়া, দন্তমূলে জিহ্বা ঠেকাইয়া একটু শব্দ করিলেন—'চিক'। তারপর ছড়া কাটিলেন, 'স্বভাব যায় না ম'লে। নীলু আমার দিকে চোখ দিয়া ইসারা করিল—ভাবটা এই যে, 'দাদা, এইবার!' দুজনে যাহা ভাবিয়াছিলাম—মা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইলেন—'অঙ্গার শতধৌতেন মলিনশ্চ নঃ মুঞ্চতে'। আমরা দুজনে হাসিয়া উঠিয়াছি—মা ঠিক 'মলিনশ্চ' বলিয়াছেন। এইবার আমাদের হাসি শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ভুল হইয়াছে। বলিলেন, 'ছাই কি মনে থাকে?' নীলু বলিল, 'তবে বলার দরকার কী'...মা'র কথার এই ভুলগুলি আমাদের মুখস্থ। অবশ্য নীলুই দেখাইয়া দিয়াছে।—তাহা না হইলে আমি হয়তো খেয়ালও করিতাম না। মা বলেন, 'দয়া দাক্ষিণাত্য'। আমি একদিন মাকে বলিয়াও দিয়াছিলাম—'দয়াদাক্ষিণ্য' বলিতে। মা'র দেখিয়াছি কথা বলিবার সময় এটি মনেই থাকে না। বলিয়া দিতে গেলে অপ্রস্তুত হইয়া যান বলিয়া আমি আর ভুল দেখাইয়াও দিই না। নীলু কিন্তু এ দিকটা ঠিক বোঝে না। অপরের যে কোনো দুর্বলতা, চালচলনে বিদ্রূপের খোরাক ওর সহজেই নজরে পড়ে; কিন্তু উহার কথার ফলে অপরের মনে কিরূপ আঘাত লাগিতে পারে, এ দিকটা সে ভাবিয়াও দেখে না।... বাবার নিকট হইতে আমরা একটু দূরে দূরেই চিরকাল থাকি। প্রয়োজনের কথা ছাড়া অন্য কোনো কথাও বড় একটা হয় না। সেইজন্য বাবার এবং আশ্রমের অন্যান্য সকলের খাইবার পর, আমি আর নীলু মা'র সঙ্গে খাইতে বসি। একটু দুধ না হইলে মা'র খাওয়া হয় না। এটিই বোধহয় মা'র একমাত্র বিলাসিতা। আশ্রমে অনেক লোকজন তো থাকে। আর সময়ে অসময়ে নূতন অতিথি আসা, ইহাও প্রায় নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই জন্য দুধ অনেক সময়েই কমিয়া যাইত! অল্প দুধ আছে, মা হয়তো আমাকে আর নীলুকে দিলেন। আমি আর একটা বাটিতে, আমাদের বাটি হইতে অল্প অল্প করিয়া ঢালিয়া মা'র জন্য রাখিলাম। নীলু দেখিয়াছি, এইরূপ

সময় নিশ্চয়ই বলিবে, 'মা'র দুধ না হলে খাওয়াই হয় না!' কথাটা এমন কিছুই নয়। কিন্তু মা'র মুখটি একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল,—যেন কোনো গোপন দুর্বলতা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। নীলুর এত জিনিস চোখে পড়ে, কিন্তু এটি পড়ে না।...

মা'র অসুখ করিলে, অসুখ একটু বেশি হইয়াছে বলিলেই যেন একটু খুশি হন। সেইজন্য জানিয়া শুনিয়াও হয়তো মা'র কপালে হাত দিয়া বলিলাম—'গা'টা পুড়ে যাচ্ছে—বেশ জ্বর হয়েছে।' নীলু সেখানে উপস্থিত থাকিলে—হাঃ হাঃ করিয়া ঘর কাঁপাইয়া হাসিয়া উঠিবে...

...সুপারিন্টেন্ডেন্টকে আমার কোনো জিনিসের দরকার নাই বলিবার পর সেদিন মনে বেশ তৃপ্তি হইয়াছিল—খালি তৃপ্তি না, গর্বই। 'সাহাব' তো একা আসেন না, সঙ্গে জেলর, ডাক্তার, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেলর, জমাদার, কয়েকজন দেহরক্ষী, ওয়ার্ডার ও মেট সকলেই ছিল। হ্যাঁ, আর যে শিখ কয়েদীটি সাহেবের খাঁকি রঙের বিরাট রাজছত্রটি ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ায় তাহার কথা তো উল্লেখ করিতে ভুলিয়াই গিয়াছি। সত্যই দোর্দণ্ড-প্রতাপ সুপারিন্টেন্ডেন্ট জেল-সাম্রাজ্যের একছত্রাধিপতি... সেদিন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার পর কাহারও মুখের দিকে তাকাইতে পারিলাম না। কেমন সব গুলাইয়া গেল—অথচ ইচ্ছা হইতেছিল আমার কথার ফল উহাদের ওপর কেমন হয় তাহা জানার। নিজেকে বেশ নাটকের নায়কের মতো মনে হইতেছিল।... সেই সন্তোষদার মুখে ছোটবেলায় স্বদেশী যুগের গল্প শুনিয়া কতবার চোখে জল আসিয়া গিয়াছে—অমর মৃতের সেই স্মৃতি আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে। 'এখন আর বিরক্ত করিও না।—শান্তিতে মরিতে দাও।' বন্দুকের গুলিতে আহত মরণাপন্ন শহীদদের সেই কথার সহিত আমার কথাটির কি শ্রোতাদের মনে কোনোই সাড়া দেয় নাই। হয়তো দেয় নাই। ইহারা নিত্যই এই জিনিস দেখিতেছে। ইহারা বয়স্ক, সংসারে অভিজ্ঞ—বালকের ন্যায় ভাবপ্রবণ নহে। লোকে প্রশংসা করুক, আমার গল্প করুক, তাহাই যেন আমি চাই—ইহা আমার মনের দুর্বলতা। এক এক সময় নিজের ওপর সন্দেহ হয়, হয়তো বা দেশের ভবিষ্যৎ অপেক্ষা আমার নামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি বেশি সজাগ। সত্যই কি তাই? একদিনের জন্যও জীবনের স্থূল উপভোগের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিই নাই। দেশের জন্য যাহা ভাল মনে করিয়াছি তাহা করিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হই নাই। নিজের ব্যক্তিগত সুখ বা ভবিষ্যতের কথা ভাবি নাই। তাহার পরিবর্তে যদি চাই যে দেশের লোক আমার সম্বন্ধে দুই একটি প্রশংসাসূচক কথা বলুক, তাহা হইলে কি আমার আকাঙ্ক্ষা অন্যায্য? জেল-ডাক্তার নিশ্চয়ই নিজের বাড়িতে আমার কথা বলিয়াছেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেলর তখনই হয়তো আপার ডিভিসন রাজবন্দীদের ওয়ার্ডে গিয়া এই কথা গল্প করিয়া আসিয়াছে। বাবাও তো সেই ওয়ার্ডে থাকেন। তাঁহার কানেও নিশ্চয়ই কথাটি উঠিবে। বাবা নির্বিকার লোক, বাহির হইতে দেখিয়া মনের ভাব বুঝিবার উপায় নাই। একান্তে বসিয়া চরকা কাটিতেছেন। চোখের কোণের

দু-ফোঁটা জলে সুতা ঝাপসা হইয়া গেল। না, বাবার নিকট হইতে অতটা ব্যাকুলতা আশা করি না। হয়তো একটু উন্মনা হইবেন, চরকায় তন্ময়তা হয়তো কিছুক্ষণের জন্য কমিতে পারে—সুতা দুই একবার বেশি ছিঁড়িতে পারে মাত্র। নিজের মনে সন্দেহ হইতেছে, আশঙ্কা হইতেছে যে, যেরূপ আশা করিয়াছিলাম জেলস্টাফের মনে সেরূপ ভাবের উদ্রেক করিতে পারি নাই। জোর গলায় বলিতে পারি নাই—চোখ নামাইয়া লইয়াছি। হয়তো উহারা ভাবিল আমার মন সরল নয়। আমার হাবভাব যেন সরকারের বিরুদ্ধে আমার অভিমান দেখানোর মতো লাগিল। উহারা দিনরাত চোর, ডাকাত, খুনে লইয়া কাজ করে। ইহার ফলে উহাদের মনের ভাবপ্রবণতা ও অনেকগুলি কোমলবৃত্তি শুকাইয়া আসিতেছে। রাজবন্দীদিগকে ইহারা অন্যান্য চোর ডাকাত অপেক্ষা পৃথক বলিয়া ভাবে না। ব্যবহারে যাহা কিছু পার্থক্য তাহা কেবল গোলমালের ভয়ে, না হয় স্বার্থের খাতিরে। যে ডাক্তার ডিভিসন থ্রির রাজবন্দীদিগকে রোগ হইলে গালাগালি করে, 'আমাশা হইয়াছে, ঔষধ দাও' বলিলেই বলে 'But don't expect Dahi' অর্থাৎ দই খাইবার প্রত্যাশায় যদি চেষ্টা করিয়া অসুখটি করিয়া থাকেন তাহা হইলে নিরাশ হইবেন, সেই ডাক্তারই উচ্চশ্রেণীর রাজবন্দীদিগের কাছে কী মাটির মানুষ! এই তো দুই বৎসরে পূর্বে 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের' সময় এই জেলস্টাফকে কংগ্রেসের নেতাদের আশেপাশে ঘুরিতে ও কাজে অকাজে খোশামোদ করিতে দেখিয়াছি। তখনও যে তাহারা ভাবিত যে কংগ্রেস আবার বিহারে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে পারে। আর আজ...

এই জেল-কর্মচারীদিগকে কি সেদিন আমার কথা আর ব্যবহার দ্বারা প্রভাবিত করিতে পারিয়াছি? ইহা অপেক্ষা যদি নাটকীয় ভঙ্গীতে জোর গলায় বলিতে পারিতাম—'জুতো মেরে গরু দান! তোমাদের কাছ থেকে আমি করুণা চাই না। কিংবা ঐ ধরনের অন্য কিছু তাহা হইলে ইহারা বেশি প্রভাবিত হইত। একটু থিয়েটারি ভাব দেখাইত বটে কিন্তু যাহা চাই তাহা হইত। মনে পড়িতেছে—দুই নম্র ওয়ার্ডে অক্টোবর মাসে লাঠিচার্জের পর মাথাফাটা অবস্থায় শুকদেও-এর বক্তৃতা—শুইয়া শুইয়া—একটানা সুরে—থিয়েটারের মরার সিনের মতো—'তুম লোগোকো শরম নহী আতা'[১] বলিয়া আরম্ভ। এখনও স্পষ্ট কানে ভাসিয়া আসিতেছে। আমি স্কুলে একবার প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় মেঘনাদবধ আবৃত্তি করিয়াছিলাম। কালীবাবু অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার শিখাইতেছিলেন—'এ পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে কনুয়ের উপর ভর দিয়ে বলবে—তারপর একেবারে শুয়ে পড়ে টেনে টেনে আস্তে আস্তে চোখ বুঁজে বলবে, 'কেবা এ কলঙ্ক তোর ভুঞ্জিবে জগতে কলঙ্কি।' ...শুকদেও এর বক্তৃতা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত একেবারে খাপ খায় নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, ইহার বিসদৃশতা অল্প লোকের চোখেই ধরা পড়িয়াছিল।...

[১] 'তোমাদের লজ্জা হয় না'।

বাবু বিজে ভৈল বা? (বাবু খাওয়া হইয়াছে?)

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। দেখিলাম ওয়ার্ডার সাহেব সম্মুখে কথার স্বরে একটু যেন সহানুভূতির আমেজ। অনেকক্ষণ হইল বাহিরে আলো দিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই। আলোটি সেলের ভিতরে দিলে ইহাদের কী ক্ষতি হইত বুঝিতে পারি না। কেরোসিন তেল লাগাইয়া আত্মহত্যা করা খুব আরামের জিনিস নয়। তথাপি ইহারা সাহস পায় না। হবেও বা। উহাদের প্রত্যেক নিয়মই অনেক অভিজ্ঞতাপ্রসূত কেবল এইরূপ একটি আপাততুচ্ছ নিয়মের জন্য গত বৎসরের জেল মিউটিনি সফল হইতে পারে নাই। গেটওয়ার্ডারকে মারিয়া কয়েদীর দল চাবির গোছা হাতে পাইয়াছিল। কিন্তু বিরাট রিংয়ে ছিল প্রায় দুই শতাধিক চাবি এবং তাহার ভিতর অধিকাংশই ছিল অপ্রয়োজনীয়। জেলের নিয়ম, এইরূপ বহু সংখ্যক বাজে চাবি রিংয়ে রাখিতে হইবে। জেলবিদ্রোহীগণ এই চাবির গোছা পাইয়াও কোন চাবি তালায় লাগিবে তাহা ঠিক করিতে পারে নাই। চেষ্টা করিতে করিতে পাঁচ মিনিট সময় কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে 'পাগলী' (alarm) বাজিল—বন্দুক, সিপাহী, ফৌজ পৌঁছিয়া গেল। ...তাহার পর...

সিপাহীজীর প্রশ্নের জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখন কটা বেজেছে?'

সিপাহীজী বলিল, 'দফা বদলির টেন হইয়াছে'—অর্থাৎ ইহাদের স্থানে রাত্রে ডিউটি দিবার ওয়ার্ডারের দল আসিয়া গিয়াছে। গুমটিতে (সেন্ট্রাল টাওয়ার) এখন কোন্ ওয়ার্ডে কত কয়েদী বন্ধ হইল, আজ নূতন কয়েদীর 'আমদানি' কত, কত 'খরচা' অর্থাৎ ছাড়া পাইয়াছে, তাহার পর একুনে মিলিল কিনা তাহার হিসাব হইতেছে। সিপাহীজী তখনও দেখি তাহার প্রশ্নটি ভুলে নাই। আবার জিজ্ঞাসা করে, 'ভোজন নহী কিয়েঁ?'

দেখিলাম সে লক্ষ্য করিয়াছে যে, আমি ভাত খাই নাই। বলিলাম—'না, খিদে পায়নি।'

সে বলিল, 'দহি হ্যায়; থোড়া ভোজন কর লিয়া যায়।' সপ্তাহে একদিন করিয়া নিম্নশ্রেণীর রাজবন্দীরা দই খাইতে পায়—পিতলের থালার উপর পাতলা মহুয়া দই—উহাতে আবার একটা পোড়াপোড়া গন্ধ,—কংগ্রেস মিনিস্ট্রির প্রবর্তিত নিয়ম—তৃতীয় শ্রেণীর রাজবন্দীদের নিত্য উপহাসের জিনিস। লক্ষ্য কংগ্রেসের বড়কর্তাদের প্রতি—কেন তাঁহারা সকল রাজবন্দীদিগের একটি মাত্র শ্রেণী করেন নাই? উচ্চশ্রেণীর নিম্নশ্রেণীর রাজবন্দী রাখিবার অর্থ কী? উচ্চশ্রেণীর দশ আনা 'খোরাকি' ও নিম্নশ্রেণীর সাড়ে তিন আনা—ইহার মাঝামাঝি একটি শ্রেণী কেবল রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যে করিলে কী হইত? নিম্নশ্রেণীর রাজবন্দীদিগকে নিজের পয়সা খরচা করিবার অধিকার দিলে কী হইত? বাহির হইতে তাহাদের জন্য খাবার বা অন্য কোনো জিনিস আসিলে, তাহা লইতে দিলে, বড়কর্তাদিগের কোন পাকা ধানে মই পড়িত? মাসে দুইখানি করিয়া চিঠি লিখিতে দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত? নিজের পয়সায় বিড়ি সিগারেট খাইবার অধিকার দিলে তাঁহাদের কী ক্ষতি হইত? আর কত কী অভিযোগ!

উঁচু গুমটির উপর হইতে সুর করিয়া জলমন্দ্র স্বরে রাগিনী উঠিল—'বোলোরে এক নম্বার! বোলারে দু নম্বার! বোলোরে তি-ই-ইন-নম্বার! বোলোরে—চা-আ-র-নম্বার! বোলোরে-এ-এ-এ পাঁচ নম্বার। বোলোরে-এ ছে-এ নম্বা-আ-আ-র। বোলোরে-এ-এ নয়া গোল। বোলোরে আওরৎ কিতা-আ-আ।'

সব ওয়ার্ডের জবাব আসিল না—বোধহয় আমার সেল পর্যন্ত সে শব্দ পৌঁছাইল না। গুমটির উপরের সিপাহীটিও যেন সব ওয়ার্ড হইতে উত্তরের প্রত্যাশা রাখে না। তাহার কাজ যন্ত্রের মতো, কলের গানের মতো একবার করিয়া চিৎকার করিয়া যাওয়া। প্রত্যেক ওয়ার্ড হইতে উত্তর আসা উচিত, কতগুলি করিয়া কয়েদী প্রতি ওয়ার্ডে বন্ধ হইয়াছে। ইহার 'টোটাল' আগেই গুমটির নিচের তলায় জেল-কর্মচারীরা করিয়া রাখিয়াছে—চিৎকারটি কেবল একটি নিয়মরক্ষা মাত্র। সব ওয়ার্ডের 'মেট' বা 'পাহারা'ই[১] এ কথা জানে। সেইজন্য ইহার উত্তর দিয়া বৃথা পরিশ্রম করিতে রাজী নয়। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল। 'গিনতি মিলান'[২] হইয়া গেল। নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। কালকের 'গিনতি মিলান' আর শুনিতে হইবে না... গুমটির উপরে আলোটা নিশ্চয়ই পাঁচশ ক্যান্ডল পাওয়ারের। ব্ল্যাক আউটের জন্য উহার কালো ঢাকনা। কিন্তু ঠিক তাহার নিচেই বাঁশের চাটাইয়ের বোনা প্রকাণ্ড একটি ছাতা—ওয়ার্ডারকে রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে ঐ বাঁচাইবার জন্য। ব্ল্যাক আউটের জন্য গুমটিতে কালচে রঙ করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ ছাতাটির উপরে আলো পড়িয়া এত আলো চারদিকে প্রতিফলিত হইতেছে যে, একটানা বেশিক্ষণ উহার দিকে তাকানো যায় না। ছাতাটি ব্ল্যাক আউটের সকল চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়াছে!... গুমটি ও তাহার উপরের ছাতাটি দেখিলেই কাশীর অহল্যাবাই ঘাটের কথা মনে পড়ে। ঘাটের সেই গম্বুজটির উপর আমাদের নিত্যকার সান্ধ্য আড্ডা ছিল।... সিন্‌হেশ্বর সুকুল একদিন উহার উপর হইতে পানের পিচ ফেলিয়াছিল—তাহা লইয়া কী হুলস্থূল কাণ্ড! অদ্ভুত সাহস সিন্‌হেশ্বরের। সে দেখিয়াছি মরিতে একটুও ভয় পায় না। সে এমন তাচ্ছিল্যের সহিত ফাঁসি যাওয়ার কথা বলিত যে, শুনিয়া আমার হিংসা হইত। বুঝিতে পারিয়াছিলাম সে আমাকে তাহাদের দলের সদস্য করিতে চায়; কিন্তু তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই। অন্তরের ভিতর খোঁজ করিয়া যখন দেখি, তখন এক এক সময় মনে হয় যে, আমার সাহসের অভাবের জন্যই বোধহয় তাহার মনোবান্‌ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই—তাহাদের কার্যক্রম পছন্দ হয় নাই বলিয়া নয়; কিন্তু আজ সে ভয় গেল কোথায়? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়াছি লোকের মৃত্যুভয় বাড়ে। আমার বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল নাকি? সিন্‌হেশ্বরের সহিত এখন দেখা হইলে কত কথা হইত। অনেকদিন পরে তাহার সহিত রামগড় কংগ্রেসের সময় হঠাৎ দেখা। সে কংগ্রেস মিনিস্ট্রির সময়

[১] Convit Overseer-দের দুইটি শ্রেণী

[২] মোট (total) মিলিয়া যাওয়া।